

আমার উজ্জ্বল ধাতুপাতের যে তারাগুলো আমরা লিবিয়ায় ফেলে এসেছিলাম সেগুলো আমার বড় ভাই-বোন নিয়ে আসবে বলে সিদ্ধান্ত হলো। এর আগে তাদেরকে আমার মায়ের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা মাল্টার একটা বোর্ডিং স্কুলে পড়ছিলো। আমার বড় বোন চিত্তহারী কিশোরী হিশাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠায় তাকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমার ভাইকেও নানীদের সাথে থাকার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হলো। আইরিশ ক্যাথোলিক স্কুল ব্যবস্থা থেকে সোজা পাকিস্তানী সংস্কৃতিতে প্রবেশ করার মানে ছিলো ছোট বাচ্চারা এখানকার অনেক কিছুই জানে না, তাদেরকে গাদা গাদা নতুন নিয়ম-কানুন শিখতে হবে দ্রুত।

পশ্চিমা এবং প্রাচ্যের সংস্কৃতির মধ্যে একটা বড় তফাত চোখে পড়ে। সেটা হলো পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের বেলায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো। আমাদের সমাজে বহু অনন্য শব্দ আছে, যেগুলো আমাদের একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এগুলো ব্রাদার, সিস্টার, আন্ট, আংকেল, গ্রান্ডমাদার, গ্রান্ডফাদার ইত্যাদি সরল ইংরেজি পরিভাষাগুলোর অনেক উর্ধ্বে। আমরা সব কিছুর শেষে আমাদের সেই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করি, যাতে প্রত্যেকে এ রকম সম্মান পায়। এমনকি আমরা যাদেরকে চিনি না তাদের নামের শেষেও সাহেব অথবা সাহেবা (জনাব/জনাবা) লাগাই। কিন্তু যাদেরকে আমরা চিনি এবং ভালোবাসি, তাদের জন্য আমাদের ভাঙারে অনেক পরিভাষা রয়েছে। আমাদের লোকেরা একজন আরেকজনকে সম্বোধনের বেলায় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে, যেগুলো সম্মান এবং ভালোবাসা থেকে উৎসারিত। ‘জি’ (অথবা বিকল্প হিশাবে ‘জান’) প্রত্যয়টা এমন এক অনুরাগ প্রকাশের পদ্ধতি, যেটা আমাদের প্রিয়জনের জন্য সংরক্ষিত। মূলত যাদের সাথে আমাদের রক্তের সম্পর্ক নেই তাদেরকেও আমরা খালা বা চাচা বলে ডাকতে শিখে বড় হয়েছি।

আরো বেশ কিছু পরিভাষা আছে। যেমন চাচা, চাচী, তায়্যা, তায়ী, আপ্পী, ভাই, ভাবী ইত্যাদি। আমার বোনের ছেলে-মেয়ের কাছে আমি খালা, আবার ভাইয়ের ছেলে-মেয়ের কাছে ফুফী। আমার ভাই আবার আমাদের বাচ্চাদের কাছে মামু (এবং তার স্ত্রীরা মামী)। এই জটিল সিস্টেমটা আরো বেশি জটিল হয় যখন আমরা যাকে তাকে সম্মান প্রদর্শনের আলামত হিশাবে ভাই বা বাজি বলে সম্বোধন করি (এর অর্থ ভাই বা বোন)। আমার বাচ্চারা এগুলো গুলিয়ে ফেলে, তবে আনন্দও পায়। এই জটিল সম্বোধনগুলোর বড় ব্যতিক্রম হচ্ছেন আমার মা-বাবা। তাদের উপনাম ছিলো বেশ স্বতন্ত্র এবং সহজ। আমাদের বেশির ভাগের কাছেই বাবা পরিচিত ছিলেন ড্যাডি বলে। মা আবার বারিমামি (বড় মা)-তে খুব দুর্বল। এ নামটা তিনি তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন। হয়তো তারা প্রচলিত নানা-নানী ডাক, যেটা সবাই ডেকে থাকে, সেটা গ্রহণ না করে এর বিপরীতে নতুন ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

আমার নানা ড. শের বাহাদুর খান পন্নী (প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সাথে তার দারুণ মিল ছিলো) অন্যদের চেয়ে যোগ্য বর হিশাবে গণ্য হলেন। আদর করে সবাই তাকে খানজি বলে ডাকতো। এক প্রভাবশালী পশতুন পরিবারের একমাত্র পুত্র ছিলেন তিনি। সেই সাথে ছিলেন মুনির খানী উপজাতির সরাসরি উত্তরসূরী। তার উজ্জ্বল মুখাবয়ব এবং লালচে-বাদামী রঙের চোখ তার কদর আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলো। স্থানীয় পরিবারগুলোকে হতাশ হতে হলো। কারণ তরুণ ডাক্তারটি পাঞ্জাবের কাসুরের কোনো এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলো। সেই মেয়েও কান্দাহারের বাতাকজাই উপজাতিভুক্ত এক পশতুন পরিবার থেকে এসেছে। বাতাকজাই কাসুরের কোত হালিম খান নামের ছোট্ট গ্রামে স্থায়ী আবাস গড়েন। তাদের এই কন্যা সবার কাছে বিজি নামে পরিচিত।

পাঞ্জাবের দারুণ ফ্যাকাশে চামড়ার অধিকারিণী কন্যা বিজির চেহারা সুসমঞ্জস ডিম্বাকৃতির। মোনা লিসার চেহারা যে প্রশান্তি ছিলো, সে কথা মনে করিয়ে দেয় এ চেহারা। তিনি খুব ধনী এবং উচ্চ শিক্ষিত এক পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি তার আধুনিকতার কারণে প্রশংসিত। ইসলাম এবং ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহে আমার দাদা নিয়মিত তাদের বাড়িতে যেতেন। কিন্তু এই দম্পতির কোনো সন্তান হয়নি। মুনির খানীর বংশধারা বজায় রাখার জন্য একজন উত্তরাধিকারী খুব দরকার হয়ে পড়লো। (আমার দাদা ছিলেন তার মা-বাবার দু সন্তানের মধ্যে একমাত্র জীবিত সন্তান। তার সুন্দরী বোন

যক্ষ্মায় ভুগে ছোট বয়সেই মারা যান।) কর্তৃত্বপরায়ণা মায়ের কাছ থেকে অব্যাহত চাপ এবং পরিবারের জোরাজুরির সামনে খানজি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেন। পরিবারের জোরাজুরিতে (এবং প্রথম স্ত্রীর অনুমতিতে) তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করলেন, উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য।

আমার বোন সুইটিকে যখন পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হলো, সে এই কাহিনী জানতে পারলো। সেখানে যাওয়ার পর থেকে সে যে ডায়েরি লিখেছে তা হাস্যরসপূর্ণ। নানার পছন্দে কিশোরী মেয়েটিকে (যে মেয়েটি পরিবারের বাইরে বিদেশে, বরং বলা যায় পশ্চিমা আবহে বেড়ে উঠেছে) শীঘ্রই তার জিস ছুঁড়ে সেলোয়ার-কামিজ ধরতে হলো। পোশাকগুলো ঢলঢলে এবং আকৃতিহীন রাখার ব্যাপারে আমার রক্ষণশীল নানার কড়া হুকুমকে অমান্য করার জন্য কিশোরীটি যখন মুখভঙ্গি করলো, গরিব টেইলার মারাত্মক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। কঠিন পরিবেশ হওয়ার পরও সে পাকিস্তানের কোলাহলময় সংসার, বর্ধিত পরিবার এবং সেখানকার বিষয়াদির প্রেমে পড়ে গেলো। আমার কাছে আশ্চর্য লাগতো, সে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার দাদা বাড়ির ব্যবস্থাটাকে (তার দুই স্ত্রী নিয়ে) খুবই ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করতো। আমি যখন তাকে সেখানকার জীবন নিয়ে নির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন করতাম, প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাবে সে বলতো, ‘দারুণ! আমি এটা ভালোবাসতাম! খাবারটা ছিলো দারুণ! লোকগুলো ছিলো দারুণ! খানজি ছিলেন দারুণ লোক!’

রক্ত সম্পর্কে দাদার ছোট স্ত্রী সাদাত সুলতান আমার দাদী, কিন্তু আমাদের পরিবারে বিজিকেও সব সময় একজন মায়ের মর্যাদা দেয়া হতো। পরিবারের সবাই তাকে অনেক শ্রদ্ধা করতো। আমাদের আপন দাদীও এ ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন। দুই স্ত্রীর মধ্যে কতটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো, সুইটি তার স্মৃতিচারণ করে। তাদেরকে সে একটা সুখী এবং বৈরিতামুক্ত বাড়ির পরিবেশে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হিসাবে বর্ণনা করে। আমার মা প্রায়ই বলতেন তারা ছয় ভাই-বোন সবাই মিলে বিজির কাছে যেতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় পূর্ণ। বাড়িতে তার মর্যাদা কখনো কমেনি।

আমার বারিমামি তার প্রথম সন্তান ইকবাল খান পল্লী জন্ম নেয়ার সাথে সাথেই তাকে বিজির হাতে তুলে দেন লালন-পালনের জন্য। বিজি তার স্বামীর এক চাচাতো ভাইয়ের সাথে নিজের বোনের মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করেন। তার বোনের ছেলে-মেয়েদেরকে তিনি নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। পরবর্তীতে তার ভাগ্নীর বিয়ে হয় আমার চাচা জাস্টিস আবদুল হাকিম খানের ছেলের সাথে। মনে হয় দুটো পরিবারই ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, আর সে কারণেই তারা আরো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত হন। তবে আমার থেকে শুরু করে পরিবারের প্রথম কাজিনদের সাথে আর কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। এর পিছনে বড় কারণ ছিলো জেনেটিক সমস্যার ব্যাপারে সতর্কতা।

অন্য দিক থেকে আবার এই দুই মহিলা দুই মেরুণ বাসিন্দা ছিলেন। বিজি একজন উৎসুক পাঠক ছিলেন। সেই সাথে তিনি সুন্দর রুটিনও মেনে চলতেন। আমার মা তার নিজের মায়ের তুলনায় ইনার কাছ থেকেই সাহিত্য এবং ত্বকের যত্নের ব্যাপারে বেশি শিখেছেন। বিজি যে তার পায়ে ত্বক কোমল করার ক্রিম না লাগিয়ে ঘুমাতে যেতেন না, সে স্মৃতি আমার মা খুব আবেগের সাথে বর্ণনা করেন। বিজি ভারী অলঙ্কার পরতে এবং সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করতেন। তার নূপুরের ওজন ছিলো প্রায় ১২ তোলা। আমার মায়ের বিয়ের সময় তিনি তার একটা টিকলি দিয়ে দেন। সেটা আবার পরে সুইটি পায়। অন্য দিকে আমার বারিমামি ছিলেন ছয় সন্তান নিয়ে ব্যস্ত এক সাধারণ মা। নিজের যত্নের দিকে মনোযোগ দেয়ার মতো সময় তার হাতে থাকতো না। তার প্রসাধনীর মধ্যে ছিলো শুধু নিভিয়ার একটা কোটা। সেটাও তিনি খুব কম ব্যবহার করতেন। এই লম্বা তরুণীর উপরে বাড়তি দায়িত্ব ছিলো অসংখ্য জিনিশপত্রে ঠাসা বড় সংসার এবং যৌথ পরিবার সামলানোর। তারপরও ড. শের বাহাদুর খানের দুই স্ত্রী আজীবন বন্ধুত্ব বজায় রেখেছেন। বিজির তুলনায় আমার নানী বয়সে অনেক ছোট হলেও বাঁচেন মাত্র এক বছর বেশি। আমার বারিমামি ভালোবাসার সাথে বিজির কাফন-দাফনের আয়োজন করেন। আমার বোনের মতে ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে দুই স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ করার কারণে এর বেশির ভাগ কৃতিত্ব খানজির।

এর উপর আবার আমার খানজি দুঃস্থদের সহায়তার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। অসংখ্য এতিম-বিধবা তার কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেতো। এটা ছিলো তার মায়ের দেখিয়ে দেয়া রীতি। কড়া নিয়মের অনুসারী হলেও তার মা খুবই স্নেহবতী এবং দানশীলা ছিলেন। আমার মায়ের আয়াকে বাচ্চা মেয়ে হিসাবে কৃতদাসীর জীবন থেকে মুক্ত করে আনা হয়েছিলো।

তার নাম ছিলো বিবি। সে ছিলো আফ্রিদি বংশোদ্ভূত। অল্প দিনের মধ্যেই সে বাড়ির কর্তৃত্ব দখলে নেয়। ঘরের কাজ থেকে শুরু করে টাকা-পয়সার বিষয়—হেন কাজ নেই, যা সে পারতো না। বিবিকে কখনো দাসীর মতো দেখা হতো না। যথা নিয়মে তাকে বিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু নিজের মতো জীবন চালানোর এবং আমাদের কাজ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়। মূল বাড়ির কাছে তাকে বড়সড় এক খণ্ড জমি দেয়া হয়। তার সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় পর্যন্ত সহায়তা দেয়া হয়। আজকে তারা আমাদের নিজেদের সন্তানদের মতোই পেশাজীবী।

আমি বিবির খুব ভক্ত ছিলাম। তার একটা অভ্যাস ছিলো সে কেনাকাটা করতে গেলে আমার জন্য অনেকগুলো রঙিন নেকলেস নিয়ে আসতো। কিন্তু সে আমার কাছে সুপারহিরো হয়ে ওঠে একটা ঘটনার পর। তখন সন্ধ্যা। আমার দাদীর দাফন হয়ে গেছে। আমার মা স্বভাবতই শোকে মূর্ছা গেছেন। (অবশ্যই) আমি ছিলাম তার সেবায় নিয়োজিত। চোখ তুলে দেখতে পেলাম আমাদের দিকে বিবি এগিয়ে আসছে। তার হাতে বর্ষার মতো একটা কাঠের দণ্ড। রুমের মৃদু আলোতে তার ছোট চোখ চকচক করে উঠলো। সে ঠোঁটে আঙ্গুল লাগালো। আমি চুপ রইলাম। জুলু যোদ্ধাদের মতো ক্ষিপ্ত গতিতে সে বিছানার মাথার দিকের এক কোনায় জোরে আঘাত হানলো। আমার মা উঠে বসলেন। তিনি ভয়ে চমকে উঠলেন। আমরা দুজনেই পাথুরে মেঝের দিকে তাকালাম। সেখানে একটা জাতসাপ দুই টুকরা হয়ে আছে। কাজটা করতে গিয়ে বিবি কোনো রকম তালগোল পাকায়নি।

বড় রান্না ঘর সব সময় লোকজনে ভর্তি থাকতো। আমার বাচাল বোনকে মা প্রায়ই বলতেন রান্না ঘরে গিয়ে কাজের লোকদের সাথে বসে থাকতে। সুইটি বাকি জীবন তার এ অভ্যাস জারি রাখে : সব সময় সে তার কাজের লোকের বাচ্চাদেরকে এমন প্রশ্রয় দেয় যেন তারা তার নিজের নাতি-নাতনী। আমাদের বাড়িতে বৈষম্যের কোনো ধারণা কখনো ছিলো না। এগুলো আমাদের বংশানুক্রমে পাওয়া মূল্যবোধ। এক দিন কাজের লোকজনকে নিয়ে বাড়িতে আছি, আমি আবিষ্কার করলাম ধন-সম্পদ অর্জনে আমার অনিচ্ছা এবং অরুচি তাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এক সময় আমার ক্লিনার ছুটি কাটিয়ে এসে আমাকে তার মায়ের বার্তা দেখালো : সব কাজের লোককে বিদায় করো, ছোট একটা বাড়িতে চলে যাও, আমার জন্য মাত্র একজন কাজের মেয়ে রাখো। তারা ভাবলো আমি নিজের বৃদ্ধ বয়সের জন্য একটা বাড়ি বানাবো। আমি হেসে বললাম, ‘কত দিন বাঁচবো বলে তোমার মনে হয়? যত দূর পর্যন্ত এসেছি, এই তো যথেষ্ট।’

আমার নানা তার দুই স্ত্রীর তুলনায়ই বেশি দিন হায়াত পেয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সচল ছিলেন। খানজি বেশির ভাগ সময় পড়ালেখায় কাটাতেন বলেই হয়তো তার স্ত্রীরা ভালো বান্ধবী হতে পেরেছে। তার রচিত বৃহদাকৃতির ‘তারিখ-ই-হাজারা’কে আমাদের হাজারা অঞ্চলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা বলে গণ্য করা হয়। তিনি আমাকে তার কাছে লেখা শেখার জন্য উৎসাহিত করতেন। লেখাগুলো সম্পূর্ণ সংশোধন করে তিনি আবার ফেরত দিতেন। শুধু যে ব্যাকরণের ভুল-শুদ্ধ ঠিক করে দিতেন, তা-ই নয়; আইডিয়াও সংশোধন করে দিতেন।

পরিতাপের বিষয় হলো আমার মায়ের পরিবারের সাথে আমি খুব কম মিশতে পেরেছি। বৃদ্ধকালটা প্রধানত তারা অ্যাবোটাবাদে কাটিয়েছেন। আর আমার নানার শেষ দিনগুলো কেটেছে আমার খালা বাড়িতে। তবে সুইটির খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো আমার মায়ের দিককার আত্মীয়দের সাথে। সে তাদের চোখের মণি ছিলো। পরিবারের প্রথম সন্তান হওয়ার কারণে সে আমার মামা-খালাদের কাছেই বড় হয়েছে। তারা তাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। আমরা মায়ের কাছে শুনেছি, তারা অসংখ্য পিকনিকে গেছেন। সাথে সব বাচ্চাকে কৌশল করে নিয়ে যাওয়া হতো। আমার নানা গাড়ি পছন্দ করতেন। চলার পথে নতুন এক্সিকিউটিভ গাড়ি চোখে পড়লেই সেটা মার্কেট থেকে নিয়ে নিতে হবে। সত্তরের দশকে একটা ওপেল রেকর্ড কেনার কথা সুইটির মনে আছে। আরেকটা ভল্ভোগন বিটল আমার ছোট খালার জন্য কেনা হয় (এখনো সেটা অ্যাবোটাবাদের বিশাল গ্যারেজে পার্ক করা আছে)।

দেশ ভাগের আগের সময়টাতে ব্রিটিশদের সাথে নানার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। হাজারা জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার (১৮৪৯-১৮৫৩) মেজর অ্যাবোট পানিয়া’র প্রধান কাইম খানকে সার্টিফিকেট সহ একটা এস্টেট দান করেন। এই লোক ছিলেন আমার নানার চাচাতো দাদা। তিনি শ্রদ্ধার সাথে লেখেন যে, কাইম খান (নিজের ভাই, ছেলে এবং ভাগ্নেদের নিয়ে) তার পাশে ডান হাতের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। মেজর অ্যাবোট লেখেন, ‘কাইম খান একজন সম্ভ্রান্ত লোক

এবং পুরো জেলায় তিনি অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। এই বিশ্বস্ত বন্ধুর জন্য আমি আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপ নিয়ে বিদায় নিচ্ছি।’ এর আগে তিনি লেখেন, ‘পানিয়ার প্রধান কাইম খান প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এবং ১৯৪৯ সালে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন।’

পুলিশ লাইন রোডের উঁচু স্থাপনাগুলো ঘিরে প্রদর্শিত রয়াল ডালটন চায়না ফার্নিচার এবং রাইফেলের বিশাল সংগ্রহ ব্রিটিশ রাজের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। ডিরেক্টর অব হেলথ পদে চাকুরির পর এই ডাক্তার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব জেলস হিসাবে ১৯৫৬ সালে অবসরে যান। পরবর্তীতে নিজের বাড়িতে খুলে বসা ক্লিনিক দারুণ শেফা (নিরাময় ঘর)-এ বছ বছর তার প্র্যাকটিস চালিয়ে যান। এখনো পর্যন্ত লোকজনের মুখে শোনা যায়, তিনি ছিলেন সে সময়ের সেরা সার্জন। তার ক্লাসিক স্টাইলের ক্লিনিকটা ছিলো মুগ্ধকর। সেটা ছিলো প্রচুর পরিমাণে কাচের বিকার আর জার সমৃদ্ধ। ঘটনাক্রমে তিনি তার মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন তার শিকড়ের দিকে। তার লেখায় তার ব্যক্তিগত সমস্যার কথা প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ তিনি সরকারী চাকুরি করা অবস্থায় মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির কারণকে সমর্থন করেছিলেন।

পরিবারের বেশির ভাগই ইংরেজ প্রভাবে অটল ছিলো। তার আপন দুই চাচা যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তার একমাত্র প্রথম কাজিন (আমেরিকায় ইটালিয়ান মায়ের গর্ভে জন্মে নেয়া) তার মুসলিম নামের বদলে রবার্ট জফরি নাম গ্রহণ করে। সে জফরি ব্যালের প্রতিষ্ঠাতা। জ্যাকুয়েলিন কেনেডি’র নিমন্ত্রণে এই ড্যান্স কোম্পানিই সর্ব প্রথম হোয়াইট হাউসে তাদের নাচের প্রদর্শনী করে। আমেরিকান টেলিভিশনেও কোনো ড্যান্স কোম্পানি হিসাবে প্রথম হাজির হয় এটি। মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারে এটি প্রথম কোনো ড্যান্স কোম্পানি। রক মিউজিকে ব্যালে সেট বানানোয় এটি প্রথম ড্যান্স কোম্পানি। টাইম ম্যাগাজিনে প্রথম কোনো ড্যান্স কোম্পানি হিসাবে প্রচ্ছদে জায়গা পায় এটি। এবং এই কোম্পানির উপরে ভিত্তি করেই বড় কোনো চলচ্চিত্র নির্মিত হয় (রবার্ট অল্টম্যানের দি কোম্পানি)।

আমার নিজের তিন চাচা পাকিস্তানের বাইরে স্থায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দেশের সাথে তারা কোনো সম্পর্কই রাখেন না। এটা সত্যিই ছিলো সম্পূর্ণ দুঃখজনক। মুনির খানীর উত্তরাধিকার চাওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো যাতে তাদের নাম আর জমিজমা টিকে থাকে। কিন্তু তাদের ওয়ারিশরা না দাবি করেছে তাদের কোনো উত্তরাধিকার, না তাদের পারিবারিক নাম। বাস্তবে আমার বড় মামা ইকবাল পরবর্তীতে আমার পাকিস্তান ফিরে আসার সিদ্ধান্তে উদ্বিগ্ন হয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। বড়দের তুলনায় তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বেশি ছিলো আমার সাথে। যে সব দুর্ঘটনা, মানসিক আঘাত এবং অপমানের মুখোমুখি আমি হয়েছিলাম সেগুলো তার ব্যথা এবং উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দেয়। আমার বড় ভাই মুনির, যার নাম রাখা হয়েছে আমাদের একজন পূর্বপুরুষের নামের সাথে মিলিয়ে, সে আমাকে প্রশ্ন করতো আমি কীভাবে পাকিস্তানের সমস্যাগুলোর সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ালাম।

আমি মুচকি হেসে জবাব দিতাম, ‘আমি আনন্দের সাথেই খাপ খাইয়েছি।’

আমার কাছে এ ব্যাপারগুলো সমস্যা নয়, চ্যালেঞ্জ। জীবন একটা ইসিজির মতো। যতক্ষণ উত্থান-পতন আছে, আমরা বেঁচে আছি। যখন রেখাটা সোজা হয়ে যাবে, মৃত্যু ঘোষণা করা হবে। কবি গালিব যেমনটা বলেছেন, ‘মৌৎ সে পেহলি জিন্দেগি ঘুম সে নাজাত পে কিয়ু (মৃত্যুর আগে জীবন কীভাবে নিরুদ্বেগ হয়)?’

ওয়ারিশকে ছেলে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মুনির খান নাম ধারণ করারও দরকার নেই, যে দুনিয়াকে আমাদের বংশধারা এবং ঐতিহ্যের কথা বলবে। ওয়ারিশদেরকে কখনো জমির মালিক হতে হয় না কিংবা তলোয়ার ব্যবহার করতে হয় না। সে তো সম্পত্তিহীন কোনো নারীও হতে পারে। শুধু দরকার ছিলো এমন একজন নারীর, যে তার শিকড়কে ভালোবেসেছিলো এবং মুচকি হাসি দিয়ে জয় করেছিলো।